বঙ্কিমী সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র

শিশিরকুমার মাইতি

'বঙ্কিম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বত্র, কুটিল। কিন্তু কী ব্যত্তিজীবন, কী কর্মজীবন, কী সাহিত্যজীবন --- সর্বত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবেদ আজীবন সরলরেখায় আবর্তিত ছিল। অসাধারণ মেধা নিয়ে তাঁর জন্ম, কঠোর কর্তব্য- নিষ্ঠায় আজীবন একলব্যের ব্রতে ব্রতী ছিল তাঁর জীবন। সেখানে ধনী-নির্ধন নেই, স্বদেশী-বিদেশী নেই, উচ্চ-নীচ নেই, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের বাদবিচার নেই, শুধু সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনের বিধান রক্ষা তার শেষ কথা। আদর্শবাদীদের আদর্শ রক্ষায় যে বিপদ থাকে, অসম্মানের যে আশঙ্কা থাকে, মৃত্যুর যে হাতছানি থাকে বঙ্কিম সেগুলিকে স্বদর্পে উপেক্ষা করে কঠোর দুস্কর কর্মযোগীর ব্রতসাধনে অবিচল অটল অচল স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সুদীর্ঘ দিনের পরাধীন একটা জাতির জাতীয় জীবনে ইংরাজ আমলে, এতো বড় ব্যত্তির বঙ্গদেশে আর্বিভাব বিস্ময়কর ঘটনা। বঙ্কিম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ মূল্যায়ন স্মরণযোগ্য ঃ "তাহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি ব্বিাস ছিল। তখন জানিতেন, বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিস্মণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনো দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।"১

সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রে বঙ্কিম কোনোদিন মুশাফির ছিলেন না। ১৫/১৬ বছর বয়সে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' আর 'সাধুরঞ্জন' নামে দুটি সাময়িক পত্রে নিয়মিত লিখে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ স্ববলে খনন করেছিলেন। ১৮ বছর বয়সেই তাঁর দু'খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৫৬)। ১৮৬৪ সালে ইংরাজী ভাষায় 'ত্মন্দপ্পস্সদ্ধ'ব্দ ভ্রনন্দ্রন্দ্ব' বইটি প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন যে মাতৃভাষায় সাহিত্য সাধনাই তাঁর আরাধ্য পথ। মাতৃভাষায় গদ্যসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সৃজনশীল কথাসাহিত্য এবং মননশীল প্রবন্ধসাহিত্য--- উভয় ক্ষেত্রেই অবাধে বিচরণ করতে শু করলেন। "মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পন্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজি পন্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ....এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।" ২

১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। 'পত্রসূচনা' অংশে কেন বাঙালা ভাষায় তিনি পত্রিকা প্রকাশে অগ্রণী হলেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার মানসিকতা আমাদের এক বিচিত্র নেশার মতো। এই নেশা নিদাণ দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন, বিপর্যয়ের মুহূর্তেও আমাদের মুত্তি দেয়। এক শতাব্দী ধরে চলে আসা এই বাঁধা বুলি বঙ্কিম-জীবনে খাটেনি। বঙ্কিম অত্যন্ত আত্মসচেতন শিল্পী ছিলেন। বন্দ্ধুমোহিত সেনকে তিনি লিখেছিলেন ঃ "আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, আমি কম লোক নই-- অতঃএব কেবল অন্তঃপুরে কাটালে চলবে না।"৩ বঙ্গদর্শনের সূচনা থেকে তিরোধানের সময়কাল, -- বাইশ বছর ধরে বঙ্কিম 'নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন।' ...সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম "এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণ কার্যে নিযুত্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।" বিপন্ন বঙ্গভাষার আর্তস্বরে কর্মযোগী বঙ্কিম বঙ্গদর্শনকে কুঠার হিসাবে ব্যবহার করে সৃষ্টিসাগরে দীর্ঘদিন নিমজ্জিত ছিলেন। আবার পঞ্চম বর্ষ থেকে শুধুমাত্র বঙ্গদর্শনের লেখক হিসাবে তাঁকে পাওয়া যায়। "যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশিচত ।" বাংলা সাময়িক পত্রের সম্পাদককে যাবতীয় কাজ করতে দেখা যায়, তিনিই হন প্রধান লেখক কিন্তু ইউরোপীয় সাময়িকপত্রের সম্পাদক কদাচিৎ লেখক। বঙ্কিমও পঞ্চম বর্ষ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রকে সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের পত্র, রাজসিংহ, বহুবল ও বাক্যবল --- প্রভৃতি কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করলেন। এরপরও তাঁর আনন্দমঠ, মাধবীলতা, কাঞ্চনমালা, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি বঙ্গদর্শনেই প্রকাশ পায়। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকে বিষবৃক্ষ, উত্তরচরিত, বাঙলার কৃষক, কমলাকান্তের দপ্তর, চন্দ্রশেখর, রজনী, চৈতন্য, কৃষ্ণকান্তের উইল, ভারত মহিমা --- পর পর প্রকাশ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গদর্শনই তাঁর সাহিত্যের প্রথম দর্শন; এই পত্রিকাতেই তাঁর সাহিত্যজীবনের আবর্তন। সরকারী কাজের চাপের মধ্যেও বঙ্কিম নিয়মিত সাধনা করেছেন।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো। বঙ্কিম তখন খ্যাতির উচ্চতম শিখরে। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস প্রকাশ করতে শু করলেন। "অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।" "তখন 'বঙ্গদর্শন'-এর ধুম লেগেছে - সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে । কী হল, কী হবে দেশশুদ্ধ সবার এই ভাবনা। 'বঙ্গদর্শন' এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারো ঘুম থাকতো না।" এই একটা উপন্যাস তৎকালীন বাঙালীর ভাবজীবনে কী বিপুল ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল তা উপরের রাবীন্দ্রিক মন্তব্য থেকে জানা যায়। সাহিত্যের গুত্বপূর্ণ সকল বিভাগে বঙ্কিমের নিষ্ঠাপূর্ণ পদচারণার অভূতপূর্ব স্বাক্ষর থাকলেও সামাজিক উপন্যাসের জন্যেই বঙ্কিমের সর্বকালীন খ্যাতি ও যশঃপ্রতিষ্ঠা রয়েছে। তবু বঙ্কিমের ১৪টি উপন্যাস নিয়ে যে বিরাট সাহিত্যসৌধ নির্মিত হয়েছে তার ভিত্তিমূলে রয়েছে দু'খানা গ্রানিট পাথর -- 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল।'৪ বঙ্কিমের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে সূক্ষ্ম ব্বিষেণধর্মী দ্বন্দ্বমুখর পারিবারিক জীবনের অনুলিপি আমরা পাইনি। ইংরাজী সাহিত্যে এই বিষয়ে বহুল রচনাসম্ভার চোখে পড়ে।

বিষবৃক্ষ (১লা জুন ১৮৭৩) ঃ বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। প্রেমের ত্রিভূজ রূপ অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক ত্রিশ বছরের সুখী, স্বচ্ছল যুবাপুষ। 'নগেন্দ্রনাথ মহা ধনবান্ ব্যত্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর।" সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে, বিষবৃক্ষের ফল অংশে দত্তপরিরারের সুবিস্তৃতা পুরীর ও বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপর ছেড়ে দিয়ে নগেন্দ্রের পর্যটনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। র

পবহি কুন্দনন্দিনীর সৌরতেজে শতচ্ছিন্ন নগেন্দ্র অন্তর্দাহে দগ্ধ হলেও জমিদারী মেজাজ ও দাম্ভিকতাপূর্ণ হুঙ্কার এই উপন্যাসে মেলে ঃ "একদিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় যোড়হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।" "দোহাই হুজুর — নাএব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দেও।"

ইতিপূর্বে তাহাঁর একজন গোমস্তা একজন প্রজাকে মারিয়া একটি টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটি টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।" (বঙ্গ দর্শন।। (১) শ্রাবণ, ১২৭৯, পৃঃ ১৫০)

নগেন্দ্রর জীবনে কুন্দের আবির্ভাবের পূর্বে নগেন্দ্র স্বয়ং সমস্ত সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করতেন। সুখী দাম্পত্যজীবনের মাঝে তৃতীয় নারী আসার পর, "বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফঃস্বলের আমলারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে।" বঙ্কিম জমিদার-প্রজার সম্পর্ক অপেক্ষা ত্রিভূজাকৃতি প্রেমের জটিল সমস্যার ব্যাপকতা ও পরিণাম নিয়ে নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস রচনায় আগ্রহী ছিলেন।

বঙ্গদেশের কৃষক ঃ বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় 'বিষবৃক্ষে'র মতো বঙ্কিমের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য রচনা হলো 'বঙ্গদেশের কৃষক' ধারাবাহিক প্রবন্ধটি ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১২৭৯), ১ম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা (কার্তিক ১২৭৯), ১ম বর্ষ নবম সংখ্যা •পৌষ ১২৭৯), একাদশ সংখ্যা (ফাল্গুন, ১২৭৯), -- মোট চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম বই ১৮৭৬ সালে 'বিবিধ সমালোচনা' নামে প্রকাশিত হয় । ১৮৮৭ সালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ এবং ১৮৯২ সালে 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' দ্বিতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত।

তৎকালে বাংলাদেশে কৃষকদের প্রকৃত অবস্থার কথা বুদ্ধিজীবিমহলে সর্বপ্রথম রেভারেন্ড লালবিহারী দে এবং 'পালামৌ' খ্যাত, বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় মেলে। লালবিহারী দে'র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' এবং 'গোবিন্দ সামন্ত', সঞ্জীবচন্দ্রের 'বেঙ্গল রায়তস্'--- সমকালের সমাজদর্পণ। কর্মসূত্রে পরিভ্রমণের জন্য দীনবন্ধু মিত্র কৃষকদের দুরবস্থার চিত্র স্বচক্ষে অবলোকন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কী দৃষ্টিতে কৃষকসমস্যাকে দেখেছিলেন সে নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। মোগল আমলে জমিদারীপ্রথা প্রচলিত থাকলেও ইংরাজ আমলেই কৃষকদের অবস্থা খারাপ হয় বেশি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রবর্তিত হলে কৃষক-জমিদার উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থা শোচনীয়, ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অত্যাধিক রাজস্বের হার, রাজস্বজমা দেওয়ার সময়সীমার বাধ্যবাধকতা এতো বেশি ছিল যে ২২ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জমিদারীর অবলুপ্তি ঘটেছিল। কর আদায়ের নামে রায়তদের সর্বস্বান্ত করে জমিদারী টিকিয়ে রাখতে, শহরে বসে আকণ্ঠ ভোগলালসায় নিজেদের মজিয়ে রাখতে একদল বিলাসী, আত্মকেন্দ্রিক, তোষামুদে, পরগাছা বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটলো। এদের স্বার্থসর্বস্ব কাজের জন্য ইংরাজ শোষণ নিপীড়ণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হলো।

ইংরাজ শাসনকালকে বঙ্কিম স্বাগত জানিয়েছিলেন। মোগল রাজত্বের শেষ পর্বে যে অরাজক বিশৃংখলা সমগ্র দেশে চলেছিল ইংরাজ আগমনে তা দূর হয়ে দেশে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। চুরি ডাকাতি কমে যায়। রেলপথ, পথ-ঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হয়। কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। কৃষিজাত আয় তিনচার গুণ বেড়ে যায়। সরকারী কর্মচারী হিসাবে বিভিন্ন জেলায় কাজকর্ম করার জন্য এই সব তথ্যের সত্যতা বঙ্কিমের জানা ছিল। জমিদারদের কৃষক নির্যাতনের চিত্র তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি বাঙলার কৃষকদের কথা চিত্রিত করেছেন।

বইটির কেন্দ্রীয় চরিত্র পরাণ মন্ডলের। সে চাষী। রহিম শেখ, রামা কৈবর্ত এবং এই শ্রেণীর ছিন্নমূল কিছু চরিত্রের অনুলিপি বঙ্কিম অঙ্কন করে জমিদারী শোষণের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। পরাণ বার্ষিক খাজনা সময়মতো জমা দেয়। নববর্ষের শুতে জমিদার ও গোমস্তাকে সে ভেট দেয়। এদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সে ফতুর হয়ে যায়। তবু শঙ্কা তার জীবনের প্রতি পদে। কখন প্রাকৃতিক ঝড়ে সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। বান-বন্যা, অজন্মায় সে অনাথ হয়ে পড়বে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে অস্থিচর্মসার হয়েও হয়ত সে বেঁচে থাকবে। তবু পাইক-পিয়াদার অত্যাচার নির্বিচারে সহ্য করে পরাণ আবার ভগ্নপ্রাণে চাষাবাদে প্রবৃত্ত হবে। জমিদারবাড়ির অনুষ্ঠানে ধার্যকরা অর্থ জমা দিতে না পারলে মিথ্যা মামলায় তাকে জড়িয়ে দেবে। ঘাম-রক্ত ঝরানো শ্রমে উৎপন্ন সোনালী ফসল জোর করে কেটে নিয়ে পিয়াদা জমিদারের গোলায় তুলবে। পরাণ সর্বশ্রান্ত হয়। তবু ঘটি বাটি বেচে জমিদারের বিপক্ষে সে খে দাঁড়ায়। কিন্তু সহায় সম্বলহীন পরাণ আদালতে হেরে যায়। তাকে হারিয়ে দেওয়া হয়। মামলা ডিসমিস হয়। পরাণকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। অদৃষ্টকে দোষারোপ করে নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা নিয়ে সে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে। পরাণ জীবনচরিত চিত্রিত করতে গিয়ে, তৎকালীন জমিদারী শোষণ-নিপীড়নের স্বরূপ অঙ্কন করতে বঙ্কিম ভোলেন নি। বঙ্কিম-প্রদত্ত একটি সমকালীন তথ্য চিত্র থেকে তাঁর সমাজ-মনস্কতার পরিচয় মেলে ঃ

নায়েবের পূণ্যাহের নজর ৬৲
জমিদারদের পাঁচ শরিকের নজর ৫৲
গোমস্তাদিগের নজর ২৲
পূণ্যাহের পিয়াদার তলবান ১৲
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ ১৲
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা দ/০
ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তলবানা ১/০
নৌকাভাড়া ১।।০
সদর আমলার পূজার পার্বণী ৬।।০
কাছারির জমাদার ১৲
ঐ হালশাহানা ১৲
পাঁচ শরিকের পার্বণী ৫৲
শ্রীরাম সেন, হেড মুহুরী ১৲
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা ২৲
গোমস্তাদের ভিক্ষা ১২৲
মুহুরীদের ভিক্ষা ৩৲
বরকন্দাজদের দোলের পার্বণী ১৲
ডাকটেক্স ৩৲

জমিদার, নায়েব, গোমস্তার পরিবারে মেয়ের বিয়ে, উপনয়ন, বাবার শ্রাদ্ধ, এমনকি হাতি পোষার খরচও কৃষকদের বহন করতে হতো। টাকায় এক আনা হিসাবে 'হাসপাতালী' আদায় করা হতো। এই ডাকটেক্স ইনকাম ট্যাক্সের মতো। আইন আদালত সবই জমিদারের নিজস্ব সম্পত্তি। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদত। জমিদারের নিজস্ব গুন্ডা, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ছিল। তাদের 'দৌরাত্ম্যে' গরীব প্রজারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আদালতে প্রতিকার চাওয়ার সাহস পেতো না। সিরাজগঞ্জের মহকুমা শাসকের

বিবরণ (১৮৭১) থেকে জানা যায় জমিদাররা যে গুন্ডা পুষতো তারা ডাকাতি, লুঠপাট, আগুন লাগানো, খুন-খারাবি করে বেড়াতো।

ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'উনিশ শতকের রায়তচিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র' নামক এক মননশীল রচনায় ১৮৭২ সালে পাবনা জেলার জমিদার কত রকম বে-আইনী কর আদায় করতো তার একটা তথ্যভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন ঃ

১. ডাক খরচা বা জমিদারদের চিঠিপত্র আদান-প্রদানের খরচ

২. তাহিরির ঃ জমিদারদের আমলাদের প্রাপ্য, রসিদ-লেখকের পাওনা

৩. নজর ঃ জমিদার বা আমলার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতির খরচ

৪. বিবাহ কর ঃ রায়ত পরিবারে কোনো বিবাহ হলে দেয়

৫. হাতি খরচা ঃ জমিদারদের হাতিপোষার খরচ

৬. ভিক্ষা ঃ রায়ত পরিবারে কোনো অনুষ্ঠানে জমিদারের পাওনা

৭. জরিমানা ঃ জমিদার মনে করলেই কল্পিত অপরাধের জন্য জরিমানাবা বেগার খাটাতে পারতো;
কোনো বিরোধ নিস্পত্তির সময়েও জরিমানা ধার্য হত

৮. তাল্লাবনি ঃ পিওনের খরচ

৯. পার্বণী ঃ জমিদার ও তার কর্মচারীদের বার্ষিক প্রাপ্য

১০. পথকর ঃ রাস্তা তৈরির জন্য খরচ

১১. বাজার ও মেলার তোলা

১২. রসদ খরচা ঃ জমিদারের মহল পরিদর্শনের খরচ

"অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। ... সেই বৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।" ৬

"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালি কৃষকের শত্রু বাঙ্গালি ভূস্বামী। ... জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।" ---এইসব উক্তি সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার বিদ্বেষী নন। সদাশয়, প্রজা বৎসল, সত্যনিষ্ঠ জমিদারদের কথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার সংখ্যা খুবই কম। অত্যাচারী, দুরাত্মা, প্রজাহন্তা জমিদারদের কথাই এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন। "যাঁহারা জমিদারদিগের কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধি।" বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারী প্রথার উদ্ভব, বিকাশ, জমিদার-প্রজার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বরূপ, কৃষকের ছিন্নমূল কণ অবস্থার কারণ --- প্রভৃতির নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ তিনি এই রচনায় করেছেন। কৃষক সমস্যাকে ভালো করে যারা জানতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন ঃ এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গীয় প্রজা" (চন্দ্রগুপ্ত ত্মগুস্ত্রব্ধগ্ন নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।" বঙ্গদর্শনের চারটি সংখ্যা জুড়ে বঙ্কিম তৎকালীন কৃষকদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র এবং ইংরাজ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। নিপীড়িত প্রজাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে যে সংগ্রাম, আন্দোলন, বিদ্রোহ তা বঙ্কিমের সমথর্ন পায়নি। অনেকটা তাঁর 'সাহিত্যগু' ঈশ্বর গুপ্তের মতোই তাঁকে সমালোচকরা সমালোচনার আসরে হাজির করেন। "আমরা সমাজ বিপ্লবের অনুমোদক নহি।" কৃষক বিদ্রোহ হলে সামাজিক স্থিতাবস্থা খুণ্ণ হবে। বঙ্কিম তা চান নি। পাবনার কৃষক বিদ্রোহকে ভিত্তি করে মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকের তিনি বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। "মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমের রায়ত সমস্যা জানার কথা নয়। কারণ জমিদারীর আয় তাঁদের পরিবারের জীবিকা ছিল না; প্রতাপ চাটুজ্যে, যাদব চাটুজ্যে সকলেই চাকুরীজীবী একালের মানুষ। শ্যামাচরণ, সঞ্জীব, বঙ্কিম এমনকি পূর্ণচন্দ্রও জমিদারী কেনাবেচা করেছেন, এমন খবর জানা নেই। ডেপুটির পেশায় গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন বলেই জেনেছেন। অগ্রজ সঞ্জীবের পড়াশোনা থেকে জেনেছেন। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত (১৮৬৩-৬৪) প্রবন্ধটির সঙ্গেও পরিচয় ছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের মতো অর্থবিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও বঙ্কিম সমস্যার গভীরে পৌঁছেছিলেন।"৭

কৃষ্ণকান্তের উইল (২৯শে আগস্ট, ১৮৭৮) ঃ "কৃষ্ণকান্তের উইল" বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, ইহা বঙ্কিম প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। রোমান্সের বিশাল জগৎ হইতে সামাজিক জীবনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বঙ্কিমের প্রতিভা এই নূতন সংযম-বন্ধনের মধ্যে একটা অসাধারণ দৃঢ় ও পেশীবহুল শক্তি লাভ করিয়াছে, স্বচ্ছন্দ-বিহার বিসর্জন দিয়া তৎপরিবর্তে এক নূতন বিশ্লেষণ-গভীরতা অর্জন করিয়াছে।" ৮ উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছদে বঙ্কিম কৃষ্ণকান্তের উইলের পূর্ববৃত্তান্ত পাঠকদের কাছে হাজির করেছেন। "হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন। জমিদারবাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমিদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কস্মিনকালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমিদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল--- তাহার নাম গোবিন্দলাল। .... তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমানভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং উইল করিয়া, আপনাদিগের উপার্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ন্যায়মতো রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। .... কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিনী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা, সম্পত্তিতে অধিকারিনী হইবেন।"৮

বইটির নামকরণ থেকে বোঝা যায় বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাহিনীর আখ্যানবস্তু। বঙ্কিম কাহিনীরশুতে জমিদার কৃষ্ণকান্তের জমিদারী মানসিকতার সামান্য পরিচয় দিয়ে সমাজ সমস্যামূলক ত্রিভূজাকৃতি প্রেমের একটি নিটোল কাহিনী চিত্রিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের আবাল্য স্বপ্ন, বিধবা বিবাহ, প্রবর্তিত হলেও উদার অন্তরে সমাজের সর্বত্র সাদরে তা আদৃত হয়নি। বাল্যে স্বামীহারা কন্যাদের নিয়ে বঙ্কিমের সময়েও সমস্যার অন্ত ছিল না। স্বামীহারা রূপবতী কন্যারা অন্যের সংসারে কায়ক্লেশে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহের কালে তারা প্রায়ই মনিবের সুখী দাম্পত্যজীবনে জড়িয়ে পড়ে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করত। অপরের দাম্পত্য সুখী জীবন দেখে এবং নিজের হতভাগ্য জীবনের কথা ভেবে কেউ কেউ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতো। পাপবোধের কথা ভুলে দ্বিতীয় নারীকে নিয়ে ভোগলালসায় সমকালে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতো। জমিদার হলে ত' কথাই নেই। লোকশিক্ষক বঙ্কিম এই সমস্যা ও তার বিষময় ফলের কথা এই উপন্যাসে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

কৃষ্ণকান্ত সামন্ততান্ত্রিক যুগের জমীদার। " আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি। আমি থানা, আমিই মজেষ্টর, আমিই জমীদার"। তিনি নিজেকে বিধাতা ভাবতেন। সমকালে আফিমের মৌতাত নেশা বলে মনে করা হতো না। এই নেশার জন্যই সমস্যার উৎপত্তি। চোর ধরতেও সাহায্য করেছিল। পুত্র হরলাল বিধবা বিবাহ করলে তিনি তাকে সম্পত্তিচ্যুত করেন। উইল চুরি করে হরলালের কার্যোদ্ধার করলেও হরলাল রোহিণীকে বিমুখ করে। গোবিন্দলালকে সে আকৃষ্ট করে এবং তাকে নিয়েই এই উপন্যাসের বিস্তার ; রোহিনীর নির্মম মৃত্যু ; ভ্রমরের নিষ্কলুষ পতিপ্রেম এবং গোবিন্দলালের হৃদয় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই এই কাহিনীর যবনিকা।

ইংরাজী সাহিত্যে 'স্প্লন্দ্বপ্ত' ও 'ত্মপ্সপ্লরুন্তন্দ্ব' নামে উপাখ্যানের যে দুটি বিভাগ আছে তার মধ্যে 'স্প্লন্দ্বপ্ত' এ যে গাঢ় বাস্তবতার চিত্র থাকে বঙ্কিমের আলোচিত দুটি উপন্যাস তার পর্যাপ্ত প্রতিলিপি মেলে। সমকালের সমাজ, পারিপার্শ্বিক সমস্যার চিত্র বঙ্কিম যে ভাবে সূক্ষ্ম শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত করেছেন তা শুধু বঙ্গ সাহিত্যের বিরল দৃষ্টান্ত নয়, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির সমপংক্তিভুক্ত করলেও অনুচিত হবে না। কোনো কোনো সমালোচকের মতে বঙ্কিম আড়াইখানা সার্থক উপন্যাস লিখে সর্বকালীন খ্যাতির মুকুট পরেছেন। 'রজনী'কেও তারা আংশিকভাবে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ত্মপ্সপ্লরুন্তন্দ্ব এ উচ্ছাস গৌরবময় ক্রিয়াকান্ড, বীরোচিত কার্যকলাপ, অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস, কবিত্বপুর্ণ কল্পনা মেলে। অবশ্য অতিপ্রাকৃত বর্ণনা, অলৌকিক অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা সাহিত্যে থাকলেও অতিপ্রাকৃত ঘটনা বা ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে আত্মিক পারম্পর্য বাস্তবতা বর্জিত হলে তা আদর্শ সাহিত্য বলে পরিগণিত হয় না। বঙ্কিমের রোমান্সধর্মী উপন্যাসেও সমাজজীবনের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং তা বাস্তবরসে রসসিক্ত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি, সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ-কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে - কারণ ইহা দেখিতে প্রকান্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে। এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। .... প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণপূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন"।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com